মৌলিক কণার সন্ধানে - অতীত থেকে বর্তমান

সোনালী সাহা
পদার্থবিদ্যা বিভাগ, সরোজিনী নাইডু কলেজ ফর উইমেন
৩০ যশোর রোড, কোলকাতা-৭০০০২৮

Date of Submission: 1st March,2014 **Date of Acceptance: 3rd March, 2014**

সারসংক্ষেপ

প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত, পদার্থের মৌলিক কণার সন্ধানে গবেষণা- তাত্ত্বিক এবং পরীক্ষামূলক- উভয়েই পাশাপাশি অগ্রসর হয়ে ক্রমে কিভাবে ঊনবিংশ শতকের প্রথম দশকের পরমাণুর ধারণা থেকে আজকের স্বীকৃত কোয়ার্ক মডেলে পরিণত হল- সেটাই এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় কর্মরত পাঠককুলের কাছে। পরমাণু থেকে শুরু করে নিউক্লিয়াস, তারও অভ্যন্তরে নিউট্রন, প্রোটন, সেই সঙ্গে কণার বিপরীত কণার প্রস্তাব কিভাবে উঠে এসেছে একের পর এক – এখানে আলোচনা করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে কোয়ার্ক আর হিগস বোসনের প্রসঙ্গ। প্রত্যক্ষ গাণিতিক রাশিমালাকে পরিহার করে বিষয়তির যেটুকু পরিচয় দেওয়া যায়, সেটুকুই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

Key words: মৌলকণা, মেসন, কোয়ার্ক

1. ভূমিকা

পদার্থের প্রাথমিক কণা কি? – অথাৎ কি দিয়ে সব কিছু তৈরী- এর উত্তরের সন্ধান শুরু হয় খ্রীষ্টপূর্বের সময়কালে। বিভিন্ন পরীক্ষায় লব্ধ ফল দার্শনিক ও তাত্ত্বিক কোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে করতে কিভাবে সেদিনের ধারণা থেকে আজকের কোয়ার্ক মডেলের প্রস্তাব – সেটাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। প্রাথমিক কণার সন্ধানে কখনও তাত্ত্বিক গবেষনা এক ধাপ এগিয়ে প্রস্তাব রেখেছে যা পরে প্রমানিত হয় পরীক্ষাগারে, কখনো পরীক্ষালব্ধ ফলাফল নতুন তত্ত্বের জন্ম দিয়েছে। এই চিত্তাকর্ষক ইতিহাস, পদার্থবিদ্যার এই শাখায় বিশেষজ্ঞ নন, কিন্তু বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় কর্মরত পাঠককুলের কাছে তুলে ধরাই বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য। এই প্রবন্ধটিতে বিষয়গুলো ক্রমানুসারে আলোচিত হয়েছে যেভাবে– প্রথম ভাগে পরমাণুর প্রস্তাব তার সাথে এর গঠন সম্পড়কে ব্যাখ্যায় পদার্থবিদ্যার সনাতনী ধারণার ব্যর্থতা। পরবর্তী বিভাগে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার প্রয়োগে পরমাণুর স্থায়ীত্ব ব্যাখ্যা। এরপর তুলে ধরা হয়েছে আইন্তাইনের আপেক্ষিকতাবাদ থেকে প্রত্যেক কনার বিপরীত কণার ধারণা। পরের বিভাগে রয়েছে নিউট্রন আবিষ্কার এবং নিউক্লিয়াসের গঠন সম্পর্কিত তত্ত্ব- নিউক্লিয়াসের স্থায়িত্ব ব্যাখ্যায় নতুন কনার প্রস্তাব এবং পরবর্তী কালে গবেষনায় তার আবিষ্কার। শেষের বিভাগে কোয়ার্ক মডেলের প্রস্তাব এবং সমএর সাথে নতুন নতুন ধর্মের কোয়ার্কের প্রস্তাব এবং বিভিন্ন পরীক্ষায় তাদের আস্তিত্ব প্রমাণ। তার সঙ্গে আলচনায় আছে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার জন্য দায়ী কনা কে?- তাত্ত্বিকভাবে তার ভবিষ্যৎবাণী যা আবার পরবর্তীকালে পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা প্রমানিত।

2. পরমাণুর গঠন ব্যাখ্যায় সনাতনী পদার্থবিদ্যার ব্যর্থতা

গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রেটাস ও ভারতীয় দার্শনিক কনাদের মতানুযায়ী যে কোন পদার্থকে ভাঙতে ভাঙতে এক ক্ষুদ্রতম কনায় পৌঁছানো সম্ভব। এই মতবাদের বৈজ্ঞানিক উত্তর আসে পরে,- ডাল্টনের পরমাণু তত্ত্বে। রসায়নবিদরা বিভিন্ন বিক্রিয়ার বিশ্লেষণ থেকে প্রতিষ্ঠা করেন যে প্রকৃতিতে যত পদার্থ আছে সেগুলো কতগুলো মৌলের সমন্বয়।

ডাল্টনের তত্ত্বানুসারে এই মৌলিক পদার্থকে ভাঙতে থাকলে এক অবিভাজ্য কনায় পৌছান যাবে যার মধ্যে পদার্থের সকল ধর্ম বিদ্যমান। এই অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম কণার নাম দেওয়া হল পরমাণু বা অ্যাটম।

কিন্তু পরমাণু অবিভাজ্য –এই ধারণা খুব বেশীদিন টিকল না। ১৮৯৭ সালে জে জে থমসন পরীক্ষাগারে দেখালেন যে উত্তপ্ত ফিলামেন্ট থেকে এক ধরণের রশ্মি নির্গত হচ্ছে যা প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত হাল্কা তড়িতাহিত ঋণাত্মক কণার সমষ্টি। তিনি প্রস্তাব করেন যে এই ঋণাত্মক কণা আসলে পরমাণুরই অংশ। কিন্তু পরমাণু যে নিস্তড়িৎ এবং এর একটা ভর আছে সেটা পূর্বেই সুপ্রতিষ্ঠিত। তাহলে পরমাণুর আরেকটা অংশ নিশ্চয়ই ভর সম্পন্ন এবং ধনাত্বক আধানে আহিত। ডাল্টনের পরমাণুর অবিভাজ্য তত্ত্বকে পরিবর্তন করে থমসন বলেন, পরমাণুর গঠন হল পুডিং এর মত- যেখানে ধণাত্বক পুডিং এর মধ্যে দানার মত ঋনাত্বক আধানের ইলেকটন গুলো বিন্যস্ত থাকে [১]।

থমসনের পরমাণু গঠনের এই ধারনা এক জোরাল সমস্যার সম্মুখীন হয় ১৯১১ সালে রাদারফোর্ডের সোনার পাত এর পরীক্ষায় [2]। এই পরীক্ষায় পাওয়া যায় যে একটা খুব পাতলা সোনার পাতের উপর ধনাত্বক তড়িতাহিত আলফা কণার রশ্মি ফেললে, একটা কম অংশের আলফা কণা কমবেশী কোণে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে, বেশীরভাগ অংশ কোনোরকম বিক্ষেপ ছাড়াই সোজাসুজি বেড়িয়ে যাচ্ছে,- কিন্তু আপতিত রশ্মির একটা খুব অল্প অংশ (প্রায় ২০০০ ভাগের এক ভাগ) খুব বেশী পরিমাণে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। থমসনের প্রস্তাবিত মডেল সঠিক হলে আপতিত রশ্মির কোনও অংশের ক্ষেত্রেই এই বেশী পরিমাণ বিক্ষেপ সম্ভব নয়। এর উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে রাদারফোর্ড পরমানুর আরেকটি মডেল প্রস্তাব করেন। এই মডেল অনুযায়ী পরমাণুর ধনাত্বক আধান এবং পরমাণুর বেশীর ভাগ ভর এর অত্যন্ত ক্ষুদ্র এক কেন্দ্রকে কেন্দ্রীভূত আছে এবং ইলেকট্রনগুলি এর বাইরে বিদ্যমান। কিন্তু প্রশ্ন হল, তাহলে বিপরীত ধর্মী আধানের মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বলের জন্য ঋনাত্বক আধানযুক্ত ইলেকট্রন কণা ধনাত্বক আধানযুক্ত কেন্দ্রকের উপর গিয়ে পড়ছেনা কেন? সেক্ষেত্রে তাহলে ইলেকট্রনের অস্তিত্বই থাকার কথা নয়! এই সমস্যা সমাধানে সৌরজগতের কথা মাথায় রেখে বলা হল কেন্দ্রকের চারিদিকে ইলেকট্রন ঘুরছে ঠিক যেমন সূর্যের চারিদিক প্রদক্ষিন করছে গ্রহরা। এই ঘূর্ণনের জন্য উদ্ভুত অপকেন্দ্র বল কেন্দ্রীয় আকর্ষণ কে প্রতিহত করে। এই ধারণাতেও একটি গুরুতর তাত্ত্বিক সমস্যা থেকে গেল,- কারণ তড়িৎ বলবিদ্যা অনুযায়ী এই ধরণের গতির জন্য শক্তিক্ষয় অনিবার্য। সেইক্ষেত্রে ইলেকট্রনের কক্ষপথের ব্যাসার্ধ কমতে থাকবে এবং এক সময় কেন্দ্রকে এসে পড়বে! অতএব পরমাণুর স্থায়িত্ব ব্যাখ্যায় পদার্থবিদ্যার তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলী ব্যর্থ হয়।

3. কোয়ান্টাম তত্ত্বের বিকাশ ও পরমাণুর গঠন

পরমাণুর স্থায়িত্বের উপযুক্ত ব্যাখ্যা আসে ১৯১৩ সালে বোরের মডেলে। ইতিমধ্যে কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ, আলোকতড়িৎ ক্রিয়ার পরীক্ষালব্ধ ফল বিশ্লেষণে ব্যর্থ হয় সনাতনী পদার্থবিদ্যার ধ্যানধারণা। উপযুক্ত ব্যাখ্যা আসে ১৯০৫ সালে আইনস্টাইনের বিকিরণের কণা সদৃশ রূপের তত্ত্ব থেকে। এর পূর্বে বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্লাঙ্ক কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ প্রসঙ্গে বলেন যে সেখানে শক্তি নির্গমন আর শোষণ প্রক্রিয়া চলছে বিচ্ছিন্ন ভাবে। আইনস্টাইন প্লাঙ্কের এই প্রস্তাবকে আরেকধাপ এগিয়ে নিয়ে বলেন যে, বিকিরণক্ষেত্র হল এক প্রকার ভরহীন কণার সমষ্টি, যার নাম দেওয়া হয় ফোটন এবং এই ফোটনের শক্তির মানগুলো হল বিচ্ছিন্ন (যেখানে সনাতনী তত্ত্ব অনুযায়ী শক্তির মান নিরবিচ্ছিন্ন)। এই তত্ত্ব থেকেই জন্ম হয় কোয়ান্টাম তত্ত্বের। বিচ্ছিন্ন শক্তিস্তরের এই ধারনাকে বিজ্ঞানী বোর প্রয়োগ করেন পরমানুর স্থায়িত্ব ব্যাখ্যায়। পরমাণুর গঠনে সনাতনী ধারণার সঙ্গে কোয়ান্টামতত্ত্বকে প্রয়োগ করে তিনি বলেন যে, নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ইলেক্ট্রন কিছু নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধের স্থিতিশীল কক্ষপথেই ঘুরতে পারে যেখানে ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগের মান একটি ধ্রুবকের (প্লাঙ্ক ধ্রুবক) পূর্ণগুনিতক। এই সমস্ত কক্ষপথে থাকাকালীন ইলেকট্রন কোনও শক্তি বিকিরণ করেনা। স্থিতিশীল কক্ষপথের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় দি ব্রগ্লীর প্রকল্পে। এই প্রকল্প অনুযায়ী শুধুমাত্র বিকিরণের কণা ধর্ম আছে তা নয়, সকল কনারও তরঙ্গ সদৃশরূপ আছে। দি ব্রগ্লি প্রস্তাবিত তরঙ্গ যেসকল ব্যাসার্ধের কক্ষপথে ইলেকট্রনের স্থানু তরঙ্গ সৃষ্টি করে দেখানো যায় সেই গুলোই বোর মডেলের প্রস্তাবিত স্থিতিশীল কক্ষপথ।

4. নিউট্রন আবিষ্কার ও নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তর

ইলেকট্রন, প্রোটন ই শুধুমাত্র যে পরমাণুর অংশ নয় – সেটা প্রকাশ পায় নতুন নতুন মৌলের উপর গবেষণালব্ধ ফলের সাথে। এরকম অনেক মৌলের সন্ধান পাওয়া গেল যাদের প্রোটন সংখ্যা একই , কিন্তু ভর আলাদা। তাহলে এক অতিরিক্ত ভর নিশ্চয়ই এর মধ্যে আছে এবং সেটা অবশ্যই নিস্তড়িত কণা, নাহলে পরমাণু নিস্তড়িত হবে না। ১৯৩২ সালে স্যাডুইক পরীক্ষাগারে এইধরনের এক নিস্তড়িত কণার আবিষ্কার করেন[3] , যার ভর প্রোটনের ভরের প্রায় সমান – যার নাম দেওয়া হয় নিউট্রন। এবার প্রশ্ন উঠল নিউক্লিয়াসের মধ্যে অল্প জায়গায় কিভাবে প্রোটন কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে? – কারণ সমধর্মী হওয়ায় তাদের মধ্যে বিকর্ষণ বল কাজ করার কথা। নিউক্লিয়াসের স্থায়িত্ব ব্যাখ্যায় প্রয়োজন হল আরেকটি আকর্ষণ বলের যেটা অবশ্যই প্রোটনগুলোর মধ্যে ক্রিয়াশীল তড়িৎ বিকর্ষণ বলের থেকে শক্তিশালী। শুধু তাই নয়, আমরা এই বলকে বাইরে থেকে উপলব্ধি করতে পারিনা (যেরকম, মাধ্যাকর্ষণ বা স্থির তড়িতের ক্ষেত্রকে পারি) কারণ সোনার পাত পরীক্ষায় এর পরমাণুর নিউক্লিয়াসের প্রোটনের মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বল যদি আপতিত ধণাত্বক আলফা কণার উপরও কার্যকরী হতো তাহলে আলফা কণা আকর্ষিত হয়ে সোনার পাতের নিউক্লিয়াসে গিয়ে পড়ত। তাই এই বল নিউক্লিয়াসের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে কার্যকরী ধরে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। ইউকাওয়া প্রস্তাব দেন[4] এই বল সৃষ্টি হচ্ছে 'মেসন' নামে এক কণা থেকে, যার ভর ইলেকট্রনের তুলনায় ৩০০ গুণ (ইলেকট্রন আর প্রোটনের ভরের মাঝামাঝি বলে নাম 'মেসন')। ইউকাওয়া প্রস্তাবিত এই কণার অস্তিত্ব পেতে বেশ কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হল। নানান পরীক্ষার পর কসমিক রশ্মি সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণের সময় এক ধরণের কণা পাওয়া গেল যার সঙ্গে মেসনের সাদৃশ্য আছে [5-7]। কসমিক রশ্মি পর্যবেক্ষণে এছাড়া আরও কণার সন্ধান পাওয়া যায় যাদের মধ্যে কিছু কিছু আবার ভূপৃষ্ঠে পৌঁছাবার আগেই বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরে বিলুপ্ত হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে নিউট্রন আর প্রোটন ই নিউক্লিয়াসের শেষ কথা নয়, তাদের থেকেও ক্ষুদ্র কণা আছে। নিউট্রন আর প্রোটনের গঠন সম্পর্কে ধারণাটা আরেকটু স্পষ্ট হল তেজস্ক্রিয় বিটা নিঃসরণের পরীক্ষালব্ধ ফল থেকে [8]। এই নিঃসরণ প্রক্রিয়ার আগে আর পরে নিউক্লিয়াসের ভর একই থাকে কিন্তু আধান যায় পালটে। নিউট্রন আর প্রোটনের ভরের মান যে প্রায় এক সেটা বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ। এই দুটি যেন নিউক্লিয়নের দুইটি ভিন্ন রূপের বহিঃ প্রকাশ [9]। তাহলে এটা ভাবা যেতে পারে যে নিউট্রন আর প্রোটনের মধ্যে যেন একটা বিনিময় প্রক্রিয়া কাজ করছে, শুধু তাই নয় নিউট্রন আর প্রোটন তাহলে একইরকম কিছু জিনিষ দিয়ে তৈরি এবং এমন সমন্বয়ে তৈরি যে নিউট্রন নিস্তড়িত এবং প্রোটন ধনাত্বক আধানযুক্ত। বিটা নিঃসরণের সময় এই গঠনকারী কণার মধ্যেই বিনিময় ঘটছে।

5. কণার বিপরীত কণার প্রস্তাব

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের কোয়ান্টাম রূপ অনুযায়ী ইলেকট্রনের শক্তি সমীকরনের দুইটি সমাধান সম্ভব, একটি ধনাত্বক অপরটি ঋনাত্বক। ধনাত্বক শক্তিস্তর নিয়ে কোন সমস্যা নেই কারণ এইক্ষেত্রে শক্তিস্তরের নিম্ন সীমা আছে। কিন্তু সমস্যা হল ঋনাত্বক শক্তিস্তর নিয়ে কারন এর কোন নিম্নসীমা নেই। সমস্যা এই কারনে যে,- যেকোনো জিনিসই চায় শক্তিস্তরের ন্যুনতম মানে থাকতে। তাহলে ইলেকট্রন নীচের দিকে পড়তেই থাকবে এবং তার ফলে অসীম পরিমাণ শক্তি বিকিরিত হবে। এই সমস্যা সমাধান করলেন বিজ্ঞানী ডিরাক। পাউলীর বর্জননীতি প্রয়োগে তার তত্ত্ব অনুযায়ী ঋনাত্বক শক্তিস্তরগুলো ভর্তি রয়েছে অসীম সংখ্যক ইলেকট্রন দিয়ে [10]। যেটি পরবর্তীকালে ডিরাকের সমুদ্র (Dirac Sea) নামে পরিচিত। সুষমক্ষেত্র হবার জন্য ইলেকট্রনের উপর কোন বল কাজ করেনা, ইলেকট্রন সাম্যাবস্থায় থাকে। কোন ফাঁকা শক্তিস্তর না থাকার জন্য ইলেকট্রনের পক্ষেও আর কোন নীচের স্তরে যাওয়া সম্ভব নয়। এবার কোনভাবে শক্তি সরবরাহ করে আমরা যদি ঋনাত্বক স্তর থেকে ইলেকট্রন ধনাত্বক স্তরে পাঠাই তাহলে ঋনাত্বক স্তরে একটা ফাঁকা স্থান তৈরী হবে। ডিরাকের ধারনা ছিল ঋনাত্বক শক্তিস্তরে এই শূন্যস্থান আসলে প্রোটন। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায় এই শূন্যস্থানের ধর্ম ইলেকট্রনের যমজ কণার মতো শুধু আধান ধনাত্বক। এর নাম দেওয়া হয় পজিট্রন [11]।

পজিট্রন কে বলা হয় ইলেকট্রনের বিপরীত কনা। এই বিপরীত কণার ধারণা শুধুমাত্র ইলেকট্রনের জন্যই প্রযোজ্য নয়, যেকোনো কণার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

6. কোয়ার্ক মডেলের উদ্ভব ও তার পরবর্তী কথা

১৯৩০ থেকে ১৯৬০ এর মধ্যে এইরকম বহু কণা আর তার বিপরীত কণার সন্ধান পাওয়া গেল, ভর অনুযায়ী যাদেরকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায়- ১) লেপ্টন (যারা অত্যন্ত হাল্কা, যেমন ইলেকট্রন) এবং ২) হ্যাড্রন (যেগুলো ভারী, যেমন নিউট্রন, প্রোটন, পায়ন)। যেমন প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রনের বিভিন্ন সমন্বয় বিভিন্ন ধরণের পরমাণুর জন্ম দিয়েছে (বর্তমানে জানা সংখ্যা ১১৪), এটা অনুমান করা হতে লাগলো, এই বিপুল কণা রাজিও আসলে আরও মৌল অল্পকিছু কণার সমন্বয়েই তৈরী। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই গেল কি সেই প্রাথমিক কণা- যা দিয়ে সব কিছু তৈরি?

১৯৬৪ সালে গেলম্যন আর জ্যিউইগ আলাদা আলাদা ভাবে প্রস্তাব রাখেন যে হ্যাড্রন গুলো মৌলতর মৌলিক কণা- কোয়ার্কের সমষ্টি [12]। তিন ধরণের ফ্লেভারের কোয়ার্কের নাম প্রস্তাব করা হয়- u (আধান ২/৩ একক), d (আধান -১/৩) এবং s (আধান -১/৩) যাদের সমন্বয়ে সমস্ত হ্যাড্রনকে পাওয়া যেতে পারে। এখানে আলাদা এক ধর্ম হিসাবে ফ্লেভার শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। এদের বিপরীত কণার ক্ষেত্রে আধান হবে বিপরীতধর্মী। কিন্তু প্রস্তাব এলেও অনেকদিন পর্যন্ত এইরকম কোন কোয়ার্কের সন্ধান পরীক্ষাগারে পাওয়া যায়নি। তখন এই সিদ্ধান্ত হল যে হ্যাড্রনের মধ্যে কোয়ার্কগুলো এতটাই সুসংহত যে কোনোভাবেই তাদের আলাদা করা সম্ভব নয়। বেশ কিছুদিন পর উচ্চশক্তি সম্পন্ন ইলেকট্রনের সঙ্গে সংঘর্ষের সাহায্যে প্রোটনের মধ্যে তিনটি পিন্ডাকার অংশের হদিশ পাওয়া যায়, যা কোয়ার্কের ধারনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ [13]।

কিন্তু কোয়ার্ক মডেল ধাক্কা খেল আরেকটি জায়গায়। কতকগুলো হ্যাড্রনের গঠনের ক্ষেত্রে কোয়ার্ক মডেলের সাথে বিরোধ বাধল পাউলীর বর্জন নীতির- যে নীতি অনুযায়ী কোন দুটি সদৃশ কণা কখনই একই শক্তিস্তরে একই জায়গায় থাকতে পারেনা। অথচ কিছু হাড্রনকে দুই বা তিনটি একই ফ্লেভারের সমন্বয় হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। এই সমস্যার আপাত সমাধান ঘটে ১৯৬৪ সালে গ্রিনবার্গের প্রস্তাবে [14]। তিনি বলেন তিনটি কোয়ার্কে শুধু ফ্লেভার নয় আরও তিনটি ভিন্ন ধর্ম আছে যা পরে লাল, নীল বা সবুজ বর্ণ দিয়ে চিনহিত করা হয়। তাহলে একই ফ্লেভার অথচ ভিন্ন বর্ণের কোয়ার্কের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে পাউলির বর্জন নীতির সঙ্গে সংঘাত থাকেনা। (এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে এই বর্ণ সেই অর্থে আমাদের পরিচিত রং নয়। একটা নতুন ধর্ম বোঝাতে ফ্লেভারের মতই এই তিন মৌলিক বর্ণের প্রয়োগ, যাদের সমপরিমান উপস্থিতিতে কোন পদার্থ হয় বর্ণহীন (colorless) ঠিক যেমন সমপরিমাণ দুই বিপরীত তড়িতাধানের সমন্বয়ে পরমাণু হয় আধানহীন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও কোয়ার্ক মডেল নিয়ে একটা অবিশ্বাস থেকেই গেল কারণ বেশ কিছুদিন পর্যন্ত কোন মুক্ত অবস্থার কোয়ার্কের পরীক্ষামূলক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এই সংকট কাটল ১৯৭৪ সালে বিজ্ঞানী টিং এর নেতৃত্বে গবেষকদলের এক নতুন মেসন কণা J আবিষ্কারের সাথে,-যার ভর প্রোটনের ভরের তিন গুণ এবং নিস্তড়িত [15]। শুধু তাই নয় এর স্থায়িত্ব কাল এই রূপ ভর সম্পন্ন অন্য হ্যাড্রনের থেকে ১০০০ গুণ বেশী। একই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কণার সন্ধান পেয়েছিলেন প্রায় একই সময় বিজ্ঞানী বারটন-এর গবেষকদল অপর এক নিরপেক্ষ পরীক্ষায় এবং এর নাম দেওয়া হয়েছিল ψ[16]। J/ψ এর গঠনের ব্যাখ্যা আসে কোয়ার্ক মডেল থেকে। তাত্ত্বিকভাবে দেখানো যায় এই নতুন কণা আসলে আরেক কোয়ার্ক C (চার্ম) এবং এর বিপরীত কোয়ার্ক C' এর বদ্ধ অবস্থা। চতুর্থ এই কোয়ার্কের প্রস্তাব এসেছিল এর আগেই ১৯৬৪ সালে বিজ্ঞানী গ্লাসওর কাছ থেকে[17]। প্রতিসমতার দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বলেন প্রাথমিক কণাকে যে দুটি মূল শ্রেনীতে ভাগ করা হয়েছে লেপ্টন আর হ্যাড্রন, তাদের সদস্য সংখ্যা এক হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহলে লেপ্টনের সদস্য সংখ্যা চার হলে কোয়ার্কের ক্ষেত্রেও তা চার হবে। এই চতুর্থ কোয়ার্কের নাম দেওয়া হয় চার্ম। ১৯৭৫ এর পর নতুন কিছু কণার আবিষ্কার হয় যেখানে মুক্ত চার্মের অস্তিত্ব প্রমানিত হয়।

কিন্তু গ্লাশোর সাদৃশ্য নীতি আপাতভাবে ব্যাহত হয় টাউ আর টাউ নিউট্রিনো এই দুই লেপ্তনের আবিষ্কারের সাথে[18]। কিন্তু দুই বছর পর আপ্সিলন নামে এক ভারী মেসন কণা আবিষ্কৃত হয়[19]। এই কণার গঠন ব্যাখ্যা করতে তখন

আবার দুইটি নতুন কোয়ার্ক b (bottom) আর t (truth) র প্রস্তাব আসে। পরবর্তী কালে গবেষনাগারে এদের অস্তিত্বও প্রমাণ হয়। আবার গ্লাশোর নীতির যথার্থতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রাথমিক কনাদের মধ্যে লেপ্তন আর কোয়ার্ক ছাড়া আরও একটি কণার অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী বলে মনে করা হয় উচ্চ শক্তি সম্পন্ন ক্রিয়া ব্যাখ্যায়। এর আগে ১৯৩৩ সালে বিজ্ঞানী ফারমি বিটা নিঃসরণ প্রক্রিয়াকে,যেটা স্বল্প সীমায় বিস্তৃত, একক বিন্দুতে কার্যকরী বিক্রিয়া হিসাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। কিন্তু সবক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যা কার্যকরী হয়নি। ফলতঃ এক ধরণের বোসন কণার নাম মাধ্যমকারী কণা হিসাবে প্রস্তাব করা হয় যেটা এই ধরণের ক্রিয়ায় আদানপ্রদান হচ্ছে। প্রসঙ্গত এই ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হ্যাড্রনগুলিকে সংহত রাখার শক্তিশালী বল থেকে ভিন্ন; তাই এই ক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বলকে ক্ষীনবল বলা হয়ে থাকে। কিন্তু ক্ষীনবলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এইরূপ কণার অস্তিত্ব তাত্ত্বিক বা পরীক্ষাগত দুইভাবেই ছিল প্রমাণ সাপেক্ষ। তাত্ত্বিক কোণ থেকে এর পক্ষে প্রথম সমর্থন আসে ১৯৮৩ সালে ক্ষীন তড়িৎ তত্ত্বে। W^+,W^- এবং Z,- ভিন্ন ভরের এই তিন কণার অস্তিত্বের পক্ষে জোরাল বক্তব্য রাখেন তিন বিজ্ঞানী গ্লাশো, ভিনবারগ এবং সালাম। এর অনেক বছর আগে বিজ্ঞানী ভিনবারগ W,Z এর ভর সংক্রান্ত সুত্র নির্ণয় করেছিলেন[20] পরে যেটা আরও পরিবর্তিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েকমাসের ব্যবধানে এই তত্ত্বের সত্যতা পরীক্ষাগারে প্রমানিতও হয় প্রোটন আর তার বিপরীত কণার সংঘর্ষ ঘটিয়ে [21,22]।

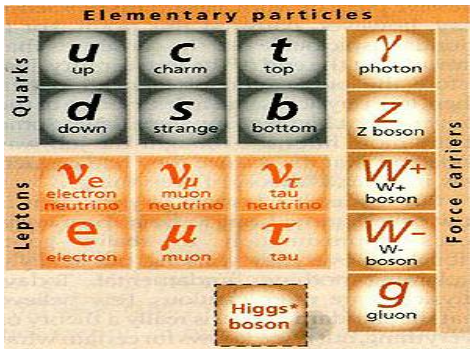

Figure 1 কোয়ার্ক মডেলে মৌল কণারাজির সারণী

এইভাবে প্রাথমিক কণার হিসাব দাঁড়ালো তিনপ্রকার – লেপ্টন, কোয়ার্ক এবং মাধ্যমকারী কণা। বিপরীতধর্মী কণাদের ধরলে লেপ্তনের সদস্য ১২, কোয়ার্কের সদস্য ৩৬ (তিন ধরণের বর্ণ ধরে) আর মাধ্যমকারী কণা ১২, অর্থাৎ মোট ৬০টি। তড়িচ্চুম্বকীয় ক্রিয়ায় মাধ্যমকারী কণা ফোটন, ক্ষীনশক্তি সংক্রান্ত ক্রিয়ায় W^+, W^-, Z; কিন্তু শক্তিশালী বল সংক্রান্ত ক্রিয়ার ক্ষেত্রে কে? বলা হল এই ক্ষেত্রে গ্লুওন নামে এক কণার আদানপ্রদান ঘটে কোয়ার্কগুলোর মধ্যে (চিত্রে প্রদর্শিত)। পরবর্তী কালে এই গ্লুওনের স্বপক্ষেও কিছু প্রমাণ মেলে। কিন্তু এই তিন *ধরণের মাধ্যমকারী কণার মধ্যে গ্লুওন বা ফোটনের থেকে* W^+, W^-, Z *এর একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে।*

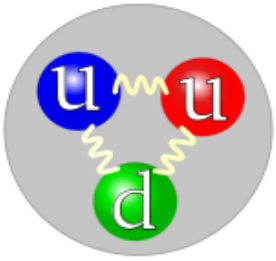

Figure 2 প্রোটন কণার গঠন

গ্লুওন আর ফোটন হল ভরহীন কিন্তু W^+, W^-, Z তা নয়। ভরসংক্রান্ত এই বৈসাদৃশ্যের ব্যাখ্যাটি শেষপর্যন্ত সূক্ষ্ম গাণিতিক গণনায় প্রতিভাত হয়। এই জটিল ব্যাপারগুলি যথাসম্ভব মোটাদাগে দেখা যাক। ইলেকট্রন এবং তার সঙ্গী ক্ষেত্র (Gauge field)- তড়িচ্চুম্বকীয়ক্ষেত্রের মধ্যে সঙ্গতির জায়গা থেকে দেখানো যায় যে এর মাধ্যমকারী কণা ফোটনের ভরহীন হওয়া বাঞ্ছনীয় কারণ এক্ষেত্রে সঙ্গতি রয়েছে শূণ্যভরের সাপেক্ষে। গ্লুওনের ক্ষেত্রেও তাই। কিন্তু ক্ষীনবল সংক্রান্ত ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সঙ্গতি স্থাপিত হয় ভরের শূণ্য থেকে বেশী মানের সাপেক্ষে। সেই কারণেই এই ধরণের ক্রিয়ার মাধ্যমকারী W^+, W^-, Z হল ভরযুক্ত। তড়িচ্চুম্বকীয় বল আর ক্ষীণবলকে যদি একটি একক প্রক্রিয়ার আওতায় আনা হয় তাহলে দেখা যায় প্রথমে মাধ্যমকারী ভরহীনকণা থেকে শুরু হয়ে পরে ভরযুক্ত কণায় শেষ হচ্ছে;- অতএব ৬১ তম আরেকটি মৌলিক কণার প্রয়োজন যার জন্য এই ভরের সৃষ্টি। এই কণার নাম দেওয়া হয় হিগস বোসন; দীর্ঘকাল অপেক্ষার পর সম্প্রতিকালে (২০১২-১৩) L.H.C তে যার পরীক্ষামূলক প্রমাণ এক আলোড়ন তৈরী করে। কিন্তু এতসব কিছুর পরেও কণারাজির সমস্ত কিছু ব্যাখ্যা হয়েছে তা নয়, বরং অনেক অনেক নতুন প্রশ্ন উঠে এসেছে; আজকের বৈজ্ঞানিক গবেষণা সেইসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য এগিয়ে চলেছে।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন- এই প্রবন্ধের লেখিকা পদার্থবিদ্যার এই শাখায় বিশেষজ্ঞ নন; এই শাখার অগ্রগতি থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই এই প্রয়াস। এই প্রবন্ধের প্রাথমিক রূপ পড়ে অধ্যাপক ডঃ শঙ্খশুভ্র নাগের দেওয়া মুল্যবান মতামত এটির বর্তমান রূপ নিতে সাহায্য করেছে। খুব সম্প্রতি এই বিষয়ের উপর এক আলোচনা সভায় অধ্যাপক ও বিজ্ঞানী ডঃ রাজর্ষি রায়ের বক্তৃতা এই প্রবন্ধকে সম্বৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছে। তাঁদের প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা।

এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি বইয়ের নাম ও লেখকদের নাম উল্লেখ করা রইল।

- F. Halzen and A. D. Martin, “Quarks & Leptons”, John Wiley & Sons, Inc(1984).
- D.Griffiths, “ Introduction ro ElementaryParticles”, John Wiley & Sons, Inc (1987).
- P.B.Pal, ”Ki Die Somosto Kichu Gora”, West Bengal State Book Board, Calcutta, Second Edn.(1997)

References:

1. J. J. Thomson, *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science* 44.269, 293(1897).
2. Rutherford, Ernest, *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science* 21.125, 669 (1911).
3. J. Chadwick, *Nature*, **129**, 312 (1932).
4. H. Yukawa, *Proc. Phys. Math. Soc. Jap*. **17**, 48(1935).
5. C. M. G. Lattes *et al*., *Nature*, **159**, 694 (1947).
6. C. M. G. Lattes *et al*., *Nature*, **160**, 453 (1947).
7. C. M. G. Lattes *et al*., *Nature*, **160**, 486 (1947).
8. F. N.D. Kurle et al. *Phys. Rev*., 49, 368(1936) and references there in.
9. F. Halzen and A. D. Martin, “Quarks & Leptons”, John Wiley & Sons, (1984).
10. P. A. M. Dirac, *Proc. R. Soc. Lond. A*,**117**, 610 (1928)
11. C. D. Anderson, *Physical Review*, **43**, 491 (1933).
12. M. Gell-Mann, *Phys. Lett*. **8**, 214 (1964)
13. J. D. Bjorken and E. A. Paschos. *Phys. Rev*. **185**, 1975 (1969).
14. O. W. Greenberg, *Phys. Rev. Lett*, **13**, 598 (1964).
15. J. Aubert, *et al. Physical Review Letters*, **33,** 1404 (1974).
16. J. Augustin, *et al. Physical Review Letters*, **33**, 1406 (1974).

17. B. J. Bjorken and S. L. Glashow, *Phys. Letter***, 11**, 255 (1964).
18. M. Pearl *et al*., *Phys. Rev. Lett***, 35**, 1489 (1975).
19. S. W. Herb *et al.*, *Phys. Rev. Lett*.,**39**, 252 (1977).
20. S. Weinberg, *Phys. Rev.Lett*.,**19**,1264(1967).
21. G. Arnison *et al.* Phys. Lett. **122B**, 103(1983).
22. G. Arnison *et al. Phys. Lett*. **126B**, 398(1983).